চীনের ধূপ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চারি আনা।

প্রকাশক

শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস,

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

কবি

বন্ধু

ভাবসঙ্গী

পরলোকগত

সতীশচন্দ্র রায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

'চীনের ধূপ'

অর্পিত

হইল।

সূচী

চীনের উপনিষৎ	...	...	১
চীনের নীতি-সংহিতা	...	...	১৮
কাঁটা বনের প্রজাপতি	...	...	৩৭
আদর্শের দ্রষ্টা	...	...	৫২

একই লেখকের লেখা

কুহু ও কেকা (কবিতার বহি)		১৲
ফুলের ফসল	(„)	॥০
হোমশিখা	(„)	১৲
বেণু ও বীণা	(„)	১৲
তীর্থ সলিল	(„)	১৲
তীর্থরেণু	(„)	১৲
জন্মদুঃখী (উপন্যাস)		৸০

বিশ্বে মহামানবের মানস-সুন্দরী
উদ্বোধিত, প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন 'পরে,
দিগ্ গজেরা তীর্থজলে অভিষেক করি'
দিকে দিকে মন্ত্রধ্বনি করে হর্ষভরে।

সর্ব্বভূমে-বরণীয় সার্ব্বভৌমগণ
সমস্বরে শান্তিপাঠ করে অবিশ্রাম,
উদ্ভাসিছে জ্বালাহীন উজ্জ্বল শোভন
লাবণ্যের স্মিত-লেখা স্নিগ্ধ অভিরাম।

পরিস্নাতা চিত্তলক্ষ্মী রত প্রসাধনে,
করিছে 'চীনের ধূপে' কেশের সংস্কার ;
আরব আতর তার মাথায় চরণে,
ইরাণ পরায় গলে গোলাপের হার।

সুরূপা য়ুরোপা তারে অঞ্জন জোগায়,—
ভারত সে অনবদ্য লীলাপদ্ম খানি ;
বিশ্বরাজ-সমাগম-আসন্ন-আশায়
বিশ্বে মহামানবের সাজে চিত্তরাণী

চীনের উপনিষৎ

[বৌদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন চীনদেশে আরো দুইটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে ; একটি আচার্য্য কং বা কংফুশিয়োর সহজজ্ঞান-প্রণোদিত 'সমূহবাদ' (Communism), আর একটি লোৎস্থ ঋষির প্রবর্তিত 'তও'-বাদ (Taoism) বা ব্রহ্মবাদ। চীন বলিতে আমরা জুতাওয়ালা চীনাম্যানকে বুঝি। সুতরাং সেদেশে যে ঋষির আবির্ভাব সম্ভব ইহা সহজে আমাদের ধারণা হয় না। কিন্তু কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুল ; ধারণাও পরিবর্ত্তনশীল !

লোৎস্থকে আমরা ঋষি নামেই অভিহিত করিব, কারণ তাঁহার চরিত্রে ঋষিত্বের উপাদান যথেষ্ট ছিল, এবং তাঁহার রচনায়, অনুবাদ

সত্বেও ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ স্পষ্ট পাওয়া যায়। ৬০৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে লোৎসু ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশব হইতেই ভারি গম্ভীর ছিলেন, সেইজন্ত লোকে ইহাকে 'লোৎসু' অর্থাৎ 'শুক্ল-কেশ শিশু' বলিত। কথিত আছে, ইনি লেখাপড়া শেষ করিয়া ভারতবর্ষ পার্থিয়া প্রভৃতি দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন এবং পিথাগোরসের মত ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যায় দীক্ষিত হন। লোৎসু 'তও'য়ের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উপনিষদের ব্রহ্ম-স্বরূপ কথনের অনুরূপ। শোনা যায়, 'ওং'কার সম্বন্ধে এদেশে যেমন নানা মুনির নানা মত, 'তও' শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া চীনদেশেও ঠিক তেমনি। কেহ বলেন 'তও' মানে ধর্ম্ম, কেহ বলেন পন্থা, কেহ বলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজ। আমাদের মনে হয়, 'অমিদো বুহ' যেমন অমিতাভ বুদ্ধের রূপান্তর 'তও' তেমনি তৎশব্দের রূপান্তর। তৎ ব্রহ্ম। অবশ্য ইহা

অনুমান মাত্র। তবে এরূপ অনুমান করিবার দুইটি কারণ আছে, প্রথম, লোৎস্যুর ভারত পরিভ্রমণ এবং ভারতীয় ভাব ও চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠতা, দ্বিতীয়, তাঁহার মতে ও রচনার সঙ্গে উপনিষদের রচনা ও মতের অসাধারণ সাদৃশ্য। তদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষের প্রভাব যে তাঁহার উপর অত্যধিক ছিল তাহার অন্য প্রমাণও আছে; 'তও'বিদ্ পণ্ডিতেরা এখনও ভারতবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মত মস্তক মুণ্ডন করে, টিকিও রাখে। এ টিকি চীনাম্যানের দীর্ঘ বেণী নহে।

লোৎস্যু-রচিত গ্রন্থের নাম 'তও-তে-চিং' অর্থাৎ 'তৎ-পথ-উপনিষদ্'। 'Ideals of the East' বা 'প্রাচ্য আদর্শ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা মনস্বী ওকাকুরা বলেন "লোৎস্যু যদি পূর্ব্ব হইতে 'তও' প্রচারের দ্বারা চীন জাতির মানসিক ক্ষেত্র নিড়াইয়া, ঢেলা ভাঙ্গিয়া, তৈয়ার করিয়া না রাখিতেন, তবে কংফুশিয়োর মতের

আওতায় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম চীন দেশে কখনই শিকড় গাড়িবার অবসর পাইত না।"

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, প্রাচীন সভ্যতার দুইটি প্রধান কেন্দ্র ভারতবর্ষ ও চীনদেশকে ভাবের দ্বারায় সম্মিলিত করার জন্য এবং এসিয়াকে অভেদ প্রমাণ করার জন্য আমরা বুদ্ধদেবের মত লৌৎসু ঋষির কাছেও ঋণী।]

'তও'

সনাতন 'তও' বাক্যের দ্বারা বর্ণিত হইবার নয়; তাহার যে নামটি জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করা যায় সেটি তাহার চিরন্তন নাম নহে।

যখন সে নামহীন তখন সে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আদিকরণ; যখন নামবিশিষ্ট তখন সে সর্ব্ব-ভূতের সবিতা। যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই ইহার তত্ত্ব জানে; যে কামনার দ্বারা কলুষিত সে কেবল বাহিরের নির্ম্মোকটি

দেখিতে পায়। আত্মা ও জড় পদার্থ,—নামে ভিন্ন বটে, মূলে কিন্তু এক। এই ঐক্য একটি অপূর্ব্ব রহস্য, ইহা তত্ত্ববিদ্যার তোরণস্বরূপ।

'তও' দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত, সেইজন্য তাহার নাম নিরঞ্জন; সে শ্রবণ শক্তিরও অতীত, সেইজন্য তাহার আর একটি নাম মৌনসত্ত্বা; স্পর্শশক্তিও তাহার নাগাল পায় না, সেইজন্য তাহাকে নিরাকার বলে। এই তিনটি গুণ বুদ্ধির অতীত এবং অভিন্নাত্মক।

'তও' নিরকারের আকার, অনির্ণীতের শব্দময় আভাস। স্বর্গমর্ত্ত্যের সৃষ্টিব্যাপারেরও পূর্ব্ব হইতে একটি সত্ত্বা বিরাজমান রহিয়াছে; সে অব্যক্ত অথচ আত্মনিষ্ঠ; অপরিস্ফুট অথচ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তাহার নাম আমার জ্ঞানের অতীত, কেবল বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য আমি তাহাকে 'তও' নামে অভিহিত করিয়া থাকি; এবং তাহাকে

বর্ণনা করিতে গিয়া 'ভূমা' বলিয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হই।

'তও' মহৎ, স্বর্গ মহৎ, পৃথিবী মহৎ, রাজাও মহৎ। বিশ্বভুবনে চারিটি শক্তি কার্য্য করিতেছে, রাজা তাহার অন্যতম। মানুষ রাজার কাছে বিধান লয়, রাজা পৃথিবীর কাছে, পৃথিবী স্বর্গের কাছে এবং স্বর্গ 'তও'য়ের কাছে বিধান গ্রহণ করিয়া থাকে। 'তও'য়ের বিধান, কিন্তু, তাহার স্ব-ভাবের বিধান ; 'তও' স্বয়ং সিদ্ধ।

'তও' যখন সংসারে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তখন তাহাকে নামাঙ্কিত করা যায় ; নামবিশিষ্ট হইলে মানুষ তাহাকে অবলম্বন করিবার সুবিধা পায় ; এবং একবার অবলম্বন করিতে পারিলে বিনাশ ও বিঘ্নের ভয় থাকে না।

'তও' সর্ব্বব্যাপী, সবাই তাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে, 'তও' কাহাকেও বর্জ্জন করে না।

'তও' মহৎকার্য্য সম্পন্ন করে, কিন্তু গৌরবের প্রত্যাশা রাখে না; সে সর্ব্ব জীবকে পালন করে, অথচ কর্ত্তৃত্বের ভাব—প্রকাশ পর্য্যন্ত হইতে দেয় না।

'তও'কে যে ধারণ করে জগৎ তাহার দ্বারস্থ।

'তও' পিছাইয়া থাকিতেই ভালবাসে; অক্ষমতাই তাহার বহির্লক্ষণ।

'তও' না যুঝিয়া জয় করিতে জানে, না ডাকিয়া কাছে টানিতে জানে এবং না চাহিয়াও নিখিল জীবের সাড়া পায়।

'তও'য়ের গতি শিথিল, ক্রিয়া মন্থর, কিন্তু ব্যবস্থা চমৎকার।

'তও' যে জাল বুনিয়াছে, সে প্রকাণ্ড; তাহার রন্ধ্রগুলিও সামান্য নয়, তবু সে রন্ধ্রের ভিতর দিয়া একটা ধূলিকণাও গলিয়া পড়ে না।

'তও'য়ের রীতি ধনুকের গুণাকর্ষণের মত;

সে উন্নতকে অবনত এবং অবনতকে উন্নত করে।

'তও' ধনাঢ্যের অতিপ্রাচুর্য্যের অংশ লইয়া স্বল্পবিত্তকে দান করে। মানুষের রীতি ওরূপ নয়। মানুষ স্বল্পবিত্তের ধন হরণ করিয়া নিজের অতিবাহুল্যকে ক্রমাগত ভারাক্রান্ত করিতেই ব্যস্ত। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত অতিপ্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের অংশ অপরকে দান করিতে পারে, এমন মানুষ এ জগতে কে আছে? যে 'তও'কে পাইয়াছে সেই।

'তও'য়ের পন্থা

সকলেই কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মাবসানে শমতা প্রাপ্ত হয়। বিকাশের পূর্ণতা ঘটিলেই আদিম দশায় প্রত্যাবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠে, আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াকেই নিয়তির সম্পূর্ণতা বলে; নিয়তির পরিপূরণ বিশ্রামের নামান্তর। ইহা একটি চিরন্তন বিধান। যে

এ বিধান জানিয়াছে সে মনীষী; যে জানে নাই সে দুর্ভাগ্য। এই সত্যের সহিত পরিচয় সাধন হইলে মানুষ উদার-চরিত হয়; উদার-চরিত হইলে ন্যায়দর্শী হয়; ন্যায়দর্শী হইলে রাজগুণে ভূষিত হয়; রাজগুণে মণ্ডিত হইলে দেবোপম হয়; দেবোপম হইলে 'তও'য়ের অধিকারী হয়। 'তও'য়ের অধিকারী অমরতা লাভ করে, তাহার শরীর ধ্বংস হইলেও সে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

যে 'তও'য়ের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া কর্ম্ম করে সে 'তও'য়ের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

'তও'য়ের জ্যোতিতে যাহার হৃদয় উদ্ভাসিত তাহাকে মোহাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। 'তও'য়ের দিকে যে অগ্রসর হইতেছে সে পিছনে হটিতেছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। 'তও'য়ের পথে যে স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলিয়াছে, বাহিরের লোক তাহাকে হোঁচট খাইতেই দেখে।

জগতের লোক যদি 'তও'য়ের পন্থা অনুসরণ করে তবে যুদ্ধের ঘোড়া চাষের কাজেই লাগিয়া যাইবে; 'তও'কে যদি অবহেলা করে তবে চাষের গরু যুদ্ধের রসদ বহিয়া মরিবে।

'তও'য়ের রাজপথ চমৎকার, কিন্তু লোকে গলিঘুঁজিই ভালবাসে।

যেখানে প্রাসাদ ও অট্টালিকা সংখ্যায় ও শোভায় অতুলনীয় সেখানে শস্যক্ষেত্রে আগাছার ভাগই বেশী দেখিবে, এবং গোলা ও মরাই দেখিবে শূন্য।

ভোজনবিলাস এবং শয়নবিলাস 'তও'পন্থীর পক্ষে অশোভন। স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ এবং রত্ন-মণ্ডিত তরবারি ব্যবহারকে আমি প্রকাশ্য দস্যুতা বলিয়া মনে করি; ইহা কখনই 'তও'য়ের অনুমোদিত নহে। ঐশ্বর্য্যমত্ততা 'তও'বিদের একান্ত পরিহার্য্য।

জিহ্বাকে সংযত কর; বাহ্যাড়ম্বর কমাইয়া দাও; নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে

সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলা স্থাপন কর; ইহাকেই 'তও'য়ের পন্থা অবলম্বন করা বলে। যে এরূপ করিতে পারে সে অনুগ্রহ ও নির্য্যাতন, সম্মান ও অপমান, লাভ ও ক্ষতি কিছুতেই বিচলিত হয় না; এরূপ পুরুষকে লোকে পুরুষোত্তম বলে।

কর্ম্মবিরতিই 'তও'-বেত্তার একমাত্র কর্ম্ম; সে শিক্ষা দেয় কিন্তু বাক্যব্যয় করে না।

ঘোলাজল কে নির্ম্মল করিবে? স্থির থাকিতে দাও,—থিতাইতে দাও, ক্রমে আপনিই সে পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। অক্ষয় শান্তি কেমন করিয়া লাভ করিবে? অপেক্ষা কর, ধৈর্য্য ধর, শান্তি আসিবেই।

কথা কমাইয়া দাও, কাজ আপনিই ঠিক হইবে।

ঝড় এক বেলার বেশী টিঁকে না, বাদল বড় জোর একটা দিন; এই তো তোমার প্রকৃতির নিয়ম; প্রকৃতির উৎসাহই যদি এত স্বল্পায়ু হয় তবে মানুষের উৎসাহ কতক্ষণ?

রিক্ততায় পূর্ণতা লাভ কর; নিবৃত্ত হও; নিবৃত্ত হও। 'তও' চিরদিনই নিষ্ক্রিয়, তবুও তাহার কোনো কর্ম্মই অসম্পূর্ণ থাকে না।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে যে কোমল সে কঠিনতমকে লঙ্ঘন করিয়া চলে; যাহার কোনো মূর্ত্তি নাই সে ছিদ্র না পাইলেও প্রবেশ করিতে পারে; কর্ম্মবিরতির ইহাই তাৎপর্য্য।

কর্ম্মচাঞ্চল্য শীত নিবারণ করে; কিন্তু তাপহরণ করে নিশ্চলতা; পবিত্রতা এবং নির্ম্মল স্থৈর্য্যই মানবজাতির সনাতন ধর্ম্ম।

কর্ম্মবিরতি অভ্যাস কর; কিছুই-না-করার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখ।

মুখ বন্ধ কর; ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাও; জীবন যতই দীর্ঘ হউক, কষ্ট পাইবে না। বাগ্মিতা অবলম্বন কর; নিজের স্বার্থ সাত কাহন করিয়া তোলো; আমরণ শান্তির আস্বাদ স্বপ্নেও জানিতে পারিবে না।

নিষ্কাম হইবার কামনা কর; দুর্লভের

লোভ আপনা হইতেই ক্ষয় পাইবে। না-শেখাটাই ভাল করিয়া শিখিয়া লও; তবেই সেই ধন পাইবে,—যাহা মানব-সাধারণ আজ খোয়াইতে বসিয়াছে।

সকলকেই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিবার অবসর দাও; ঘাঁটাইয়ো না।

পিছাইয়া থাক, সমুখের আসন তোমাকেই দেওয়া হইবে; ঠেলিয়া অগ্রসর হও, গলাধাক্কা খাইবে।

মাথা যে নোয়াইতে জানে সে কখনো মাথা খোয়ায় না। যে, একবার নত হইয়াছে, সেই ঋজুভাবে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পাইবে; যে রিক্ত সেই পূর্ণ হইবে; যে জীর্ণ শীর্ণ সেই নব সৌন্দর্য্য লাভ করিবে। যে স্বল্পবিত্ত সেই সাফল্যের অধিকারী; যাহার অনেক আছে সে বিপথে যাওয়াই সম্ভব।

মিতব্যয়ী হও, প্রার্থীজনকে বিমুখ করিতে হইবে না; ধীর হও, সাহসিকতা হঠকারিতায়

পর্য্যবসিত হইবে না; পিছাইয়া থাক, নেতৃত্ব করিতে পারিবে।

ধীরতা আক্রমণকারীকে জয়মাল্যে বিভূষিত করে, এবং আক্রান্তকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করে।

দেবতারা যাহাকে রক্ষা করিবেন, তাহাকে তাঁহারা ধীরতায় মণ্ডিত করিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

হেঁয়ালি

মাটি দিয়া কলস গড়িতে হয়, কিন্তু কলসের সার্থকতা উহার ঐ শূন্য গর্ভটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাড়ী করিতে হইলে বাতায়ন রাখিতে হয়; ঐ ফাঁকা জায়গাগুলাই বাড়ীকে বাসের যোগ্য করে। বস্তুর বাস্তবতা খুবই ভাল, কিন্তু উহার ভিতরের অবস্তুই উহাকে সফলতা দান করে।

মানুষ যখন জন্মায়, তখন ভারি কোমল,

ভারি দুর্ব্বল; কিন্তু যখন মরে তখন অত্যন্ত শক্ত এবং একেবারে দুর্দমনীয়! অঙ্কুর ভঙ্গুর; কিন্তু মরা গাছ ঘাতসহ এবং সুকঠিন! সুতরাং কাঠিন্য এবং দুর্দমনীয়তা মৃত্যুর লক্ষণ কোমলতা এবং দুর্ব্বলতা জীবনের সহচর।

জলের মত গড়াইয়া-পড়া অশরণ জিনিষ জগতে নাই, অথচ লোহার মত শক্ত জিনিষকে আক্রমণ করিতে সে অদ্বিতীয়!

যে কথা সকলের চেয়ে সত্য তাহা হেঁয়ালি বলিয়া ভুল হয়।

বিবিধ উক্তি

মানুষ কেহই বর্জ্জনীয় নয়; জিনিষ কিছুই ত্যাজ্য নয়; ইহাকেই বলে শুদ্ধ বুদ্ধি; ইহারই নাম সম্যক্ দৃষ্টি।

অনাড়ম্বর প্রারম্ভ যাহার দৃষ্টি এড়ায় না সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছে; দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করিয়াও যে নিজের উপর নির্ভর

করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে সেই প্রকৃত শক্তিমান।

ভাল কথা কহিয়া, মানুষের হাটে, সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারা যায়; কিন্তু ভাল কাজ করিলে অপরিচিতের মধ্যেও সুহৃদ্‌লাভ ঘটে।

ভাল মানুষের কাছে আমি ভাল মানুষ; যে ভাল নয়, তার কাছেও আমি ভাল,—তাহাকে ভালর দিকে টানিবার জন্য।

যে গাছ দুই হাতে আঁকড়িয়া পাওয়া যায় না সে একটি নিতান্ত সূক্ষ্ম অঙ্কুরের পরিণতি; সপ্ততল হর্ম্ম্য একটা ক্ষুদ্র মৃৎ-স্তূপের উপর নির্ভর করিয়া আছে; হাজার ক্রোশব্যাপী পর্য্যটনের প্রারম্ভ একটি ক্ষুদ্র পাদক্ষেপে।

সংসারে যে সব কর্ম্ম কঠিন, তাহা সময়ে সহজসাধ্য ছিল; যাহা বড় তাহা ছোট ছিলই; কঠিন কাজ সহজ থাকিতেই আরম্ভ করিয়া দাও; বড় কাজ ছোট থাকিতেই আয়ত্ত করিয়া ফেল; যিনি মনীষী, যিনি 'তও'কে

জানেন, তিনি কখনো 'বিরাট' ব্যাপারে হাত দেন না, অথচ মহৎ ফলের তিনিই অধিকারী।

বেশী কথা বলিলে, বলিবার কথা ফুরাইয়া যায়, মধ্যপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

চীনের নীতি-সংহিতা

[লোৎসু ঋষির আবির্ভাবের ৫৩ বৎসর পরে চীন দেশে আর একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম কংফুশিয়ো; অর্থাৎ আচার্য্য কং।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইঁহাকে প্রাচ্যভূমির কোম্ত্ বলিয়া থাকেন। সাদৃশ্যও কতকটা আছে। কংফুশিয়ো ও কোম্ত্ উভয়েই বাল্যকাল হইতে স্ব স্ব সমাজের সংস্কার-সাধনের জন্য দৃঢ়সংকল্প; উভয়েই বিচারসাপেক্ষ, যুক্তিযুক্ত, নির্ম্মল জ্ঞানের পক্ষপাতী; উভয়েই ধর্ম্মকে নীতিবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসী। কংফুশিয়ো চল্লিশ কোটি চীনাম্যানকে একটি সুবৃহৎ পরিবারে পরিণত করিয়াছেন; কোম্ত্

বিশ্বমানবের সুদূর কল্পনাকে সম্ভাবনার অভিমুখে টানিয়া আনিয়াছেন। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মহম্মদের পরেই, মতের উদারতা ও সার্ব্বজনীনতার জন্য, কংফুশিয়ো এবং কোম্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য্য কং পণ্ডিত, দার্শনিক, নীতিকুশল, নব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা; কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মতন ইনি চীনদেশের প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকর্ত্তা।

কংফুশিয়োর ধর্ম্মে স্বর্গের ভরসা বা নরকের ভয় নাই। তিনি আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও অতিপ্রাকৃতকে বড় একটা আমল দিতেন না। তিনি বলিতেন—অন্যায় করিলে ইহজীবনেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, যে ব্যক্তি পাপের ভোগ ভুগিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যায় সে তাহার পাপের বোঝা পুত্র বা পৌত্রের ঘাড়ে চাপায় মাত্র। এখনকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রও কতক পরিমাণে এ কথার সমর্থন করে। কংফুশিয়োর ধর্ম্ম সত্যের

উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রধানতঃ জ্ঞানমূলক বলিয়া, তাহা নৈতিক আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে পারে নাই এবং ঐ একই কারণে চীন দেশের শিক্ষিত সমাজে অদ্যাবধি ইহার এত প্রতিপত্তি। সমাজের বৃহৎ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের ঐকতান সাধন, পিতৃ-পূজারূপ প্রাচীনপদ্ধতির অনুবর্তন এবং ন্যায়ধর্ম্মের সম্যকসংরক্ষণ, ইহাই আচার্য্য কংয়ের ত্রিপিটক।

আজ পর্য্যন্ত চীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক পাঠশালায় কংফুশিয়োর নামাঙ্কিত এক একখানি প্রস্তরফলক যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং প্রত্যহ শিক্ষাকার্য্যের আরম্ভে এবং অবসানে শিক্ষক ও ছাত্রেরা মিলিয়া ঐ অক্ষরময় স্মরণ-চিহ্নের সম্মুখে মহাপুরুষ কংফুশিয়োর উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। লোক-বাহুল্যে চীনদেশ একটা প্রকাণ্ড মধুচক্রের

মতন হইলেও এবং পুলিশ-পাহারার বিশেষ রকম বন্দোবস্ত না থাকিলেও সে দেশে যে অপরাধের সংখ্যা য়ুরোপের তুলনায় অত্যল্প তাহার একমাত্র কারণ তত্রত্য জনসমাজে কংফুশিয়োর নীতিশিক্ষার যুগব্যাপী বিস্তার। চীন দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কু-হাং-মিং এইরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন্ত্ যেমন ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসাবশেষের উপর মহামানব-ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন, কংফুশিয়ো তেমনি অন্তর্বিরোধে 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' চীনদেশকে মহাচীনে পরিণত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কাহারো দ্বারস্থ না হইয়া এবং বিশেষ কোনো আড়ম্বর না দেখাইয়া, কেবল চরিত্র ও উপদেশের গুণে জন কয়েক মানুষের মতন মানুষ তৈয়ার করিয়া তোলেন।

কংফুশিয়ো বলিতেন "নৈতিক জীবনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা এবং পিতা মাতাকে মানিয়া চলা, মানবজীবনে ইহাই কেবল শিক্ষণীয়; যে নিজের পিতা মাতাকে মানিতে শিখিয়াছে সে সাম্রাজ্য-রূপ বৃহৎ পরিবারের পিতৃস্থানীয় রাজাকেও মানিবে এবং যে নৈতিক জীবনের মর্ম্ম বুঝিয়াছে সে কথনো বিচারাসনে বসিয়া লোভে বা মোহে ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি করিবে না।" এইরূপ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া কংফুশিয়োর শিষ্যেরা গুরুর উপদেশ অনুসারে একে একে রাজার অধীনে শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন এবং ক্রমশ সমদর্শী বিচারে এবং চরিত্রের মহত্ত্বে বিচারাসনের গৌরববৃদ্ধি ও স্বদেশের প্রভূত মঙ্গল-সাধন করিতে সমর্থ হন।

কংফুশিয়ো একেবারে গোড়া বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন; তিনি তরুণ মনের উপর বিতর্কের বাটালি চালাইয়া শিষ্যদিগকে

মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; "পচা কাঠে নক্সা চলে না" ইহা তাঁহার একটি অমূল্য উপদেশ।

সংস্কার যুক্তির দ্বারা পুনঃশোধিত করিয়া, পবিত্র পারিবারিক আদর্শ সাম্রাজ্য তন্ত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তিনি বহু সর্দ্দারের সর্দ্দারী হইতে চীন দেশকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন; নিষ্কলঙ্ক জীবন ও অলোকসামান্য চরিত্রকে তিনি অনশ্বর দান করিয়াছেন; ঐক্যের নিগূঢ় সূত্রে তিনি অনেককে বাঁধিয়াছেন;—চল্লিশ কোটি চীনাম্যান আড়াই হাজার বৎসরেও সে কথা ভুলিতে পারে নাই।

রামানুজের সঙ্গে শঙ্করের যে সম্বন্ধ, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের যে সম্বন্ধ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের যে সম্বন্ধ, লোৎসুর সঙ্গে কংফুশিয়োর সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। ইহা ওকাকুরার কথা।

কংফুশিয়ো মনীষী, মহাপুরুষ, সমগ্র মানব-

জাতির গৌরবের সামগ্রী। ভারতবর্ষ এবং চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে হিমালয়ের ব্যবধান থাকিলেও চীনবাসী বুদ্ধবাণী শিরোধার্য্য করিয়াছে; আশা করি শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট কংফুশিয়োর অমৃত উপদেশ অনাদৃত হইবে না।]

ধর্ম্মনীতির মধ্য-পন্থা

ঈশ্বরের বিধান আমাদের অস্তিত্বের বিধান; এই অস্তিত্বের বিধান যখন অবাধে কার্য্য করে তখন তাহাকে নৈতিক বিধান বলে। শৃঙ্খলাবদ্ধ নৈতিক বিধান ধর্ম্মের নামান্তর।

যে বিধানের অব্যাহত প্রভাবের সম্বন্ধে মুহূর্ত্তের জন্যও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের সম্ভাবনা নাই তাহাই নৈতিক বিধান। যে আইনে ফাঁকি চলে তাহা নৈতিক বিধান হইতেই পারে না।

হর্ষ, শোক, ক্রোধ অথবা ঐরূপ কোনো উত্তেজনা যতক্ষণ না জাগিয়া উঠে ততক্ষণই

আমরা স্বস্থ। এই স্বাভাবিক অবস্থাই আমাদের নৈতিক সত্তা।

চিত্তবৃত্তির প্রত্যেকটিই যখন সম্যক্ পরিণতি লাভ করে তখনই নৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপনের উপযুক্ত সময়।

নৈতিক সত্তার কেন্দ্রস্থ সূত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সেই সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, সুশৃঙ্খল বিশ্ব-ব্যাপারের সঙ্গে যোগ-যুক্ত হওয়াই মানুষের মহত্তম পরিণতি।

প্রকৃত নৈতিক জীবন কেন যে দুর্লভ তাহা বুঝিয়াছি; যিনি পণ্ডিত তিনি নৈতিক জীবনকে এত বড় করিয়া দেখান, যে সাধারণের পক্ষে দৈনিক কর্ম্মময় জীবনের সঙ্গে তাহাকে আর খাপ্ খাওয়ানো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; যে অজ্ঞ সে নৈতিক জীবন সম্বন্ধে বড় একটা খবরই রাখে না; সুতরাং সে উহার সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন। কেহ ডিঙাইয়া বড় হইতে যায়, কেহ নাগালই পায় না।

গুণের অভাবকেই দোষ বলে; দোষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ভালোর অভাবই মন্দ; ভালোই আছে, মন্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অস্তি ও নাস্তির মাঝখানে যে পথ তাহাই মধ্য পন্থা, তাহাই অবলম্বনীয়।

অনেকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে বুদ্ধির অগম্য নিগূঢ় অর্থ খুঁজিতে ব্যস্ত হন, এবং নানারূপ উৎকট বা অসাধারণ আচরণের দ্বারা লোকের নিকট বিশিষ্ট হইয়া উঠেন; আমি এ পন্থা গ্রহণীয় মনে করি না।

অনেকে নৈতিক জীবন অবলম্বন করিয়াও মধ্যপথের বিপরীত আচরণ করেন; আমি উহা শ্রেয় মনে করি না।

যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক তাঁহারা স্বপ্নেও বিশ্বশৃঙ্খলার বাহিরে গিয়া পড়েন না। জগৎ তাঁহাদের জানে না, লোকে তাঁহাদের চেনে না। মানুষের মধ্যে ইহারাই দেবতা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতি প্রকাণ্ড হইলেও মানুষের

নৈতিক সত্ত্বা উহার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে না; নৈতিক আদর্শ এতই সুমহৎ, যে, নিখিল জগতেও তাহার স্থান সংকুলান হয় না; মানুষের মন ভিন্ন কোন বস্তুই তাহাকে ধারণ করিতে পারে না।

নৈতিক বিধান বাস্তব-জীবনের বাহিরের জিনিস নহে; যদি বাস্তব-জীবন হইতে উহাকে তফাৎ করিতে চাও তবে আর উহাকে নৈতিক বিধান বলিয়ো না।

অন্তের যেরূপ ব্যবহারে নিজে বিরক্ত হও অন্যের প্রতি সেরূপ ব্যবহার ভুলিয়াও করিতে নাই।

প্রকৃত সদ্ব্যক্তি বাহিরের সঙ্গে নিজেকে সহজেই মিলাইয়া লইতে পারেন; তিনি অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। আরামের মধ্যে তিনি আমীর, অভাবের মধ্যে তিনি ফকির, বর্ব্বরের দেশে তিনি সহৃদয়, বিপদের দিনে তিনি বীর।

অভ্যুদয়ে তিনি অধীনের উপর অযথা কর্তৃত্ব প্রকাশ করেন না; দশা-বিপর্য্যয়ে প্রসাদভিখারী হন না; তিনি নিজের আচরণ চারুতর করেন এবং কিছুরই প্রত্যাশা রাখেন না; তিনি ভগবানের কাছে অনুযোগ করেন না এবং মানুষের নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হন।

নৈতিক জীবন অবলম্বন তীর্থযাত্রার মতন, একেবারে নিকটের ঘাটেই নৌকা প্রস্তুত; ইহা পর্ব্বতারোহণের মতনও বটে, একেবারে নীচেকার ধাপ হইতেই ইহার আরম্ভ।

মানুষ চরিত্রের উপযুক্ত সম্মান লাভ করে, তাহার উপযুক্ত সম্পদ লাভ করে, পরমায়ুও পায় সেই অনুপাতে। বিধাতা জীবন দিয়াছেন সকলকেই; কিন্তু পরমায়ুর অল্পাধিক্য, সম্ভবত, গুণানুসারেই হইয়া থাকে। যে গাছ জীবনীশক্তিতে পূর্ণ স্বয়ং বিধাতা তাহার রক্ষক; আর যে গাছ পতনোন্মুখ তাহাকে

তিনিই উৎপাটিত করিয়া ধ্বংসকার্য্যের সহায়তা করেন।

চরিত্রবান পুরুষের করণীয় চারিটি কর্ম্মের একটিও আমি সম্যকরূপে করিয়া উঠিতে পারি নাই; (১) আমি পুত্রের কাছে যেরূপ ব্যবহার আশা করিয়া থাকি আমার পিতার প্রতি সেরূপ ব্যবহার আমি করি নাই; (২) আমি আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর কাছে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি আমার সম্রাটের প্রতি সেরূপ ব্যবহার আমি করি নাই; (৩) আমার কনিষ্ঠের নিকট যেরূপ ব্যবহার আমি আকাঙ্ক্ষা করি আমার জ্যেষ্ঠের প্রতি ঠিক্ সেরূপ ব্যবহার করিতে আমি সমর্থ হই নাই; (৪) বন্ধুদের কাছে আমি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি, বন্ধুদের প্রতিও ঠিক সে ব্যবহার আমি করিতে পারি নাই।

কর্ত্তব্যসাধনে বা কথাবার্ত্তায় যখনি

নিজের ত্রুটি দেখিতে পাইবে, স্বীকার করিয়ো উন্নতির পথে আবর্জ্জনা জমিতে দিয়ো না।

অখণ্ড সত্য যাহার করায়ত্ত সে আপনার নিগূঢ় সত্তার তলস্পর্শ করিয়াছে ; যে আপনাকে ঠিক তলাইয়া বুঝিয়াছে সে অপরকেও বুঝিতে সমর্থ ; যে অপরের মর্ম্ম জানে প্রকৃতির রহস্য তাহার অবিদিত নাই ; যে প্রকৃতির রহস্য জানে সে সৃষ্টিরহস্যের তত্ত্বও জানিয়াছে ; যে সৃষ্টিরহস্যের তলস্পর্শ করিয়াছে সে সৃষ্টিকর্ত্তার অখণ্ড শক্তির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে।

অখণ্ড সত্যের ক্ষয় নাই ; ক্ষয় নাই বলিয়া তাহা অনন্ত ; অন্তহীন বলিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ; স্বয়ংসিদ্ধ সুতরাং স্বয়ম্ভূ ; স্বয়ম্ভূ অতএব অনাদি অনাদি সুতরাং গহন এবং গভীর গভীর বলিয়াই বুদ্ধির অতীত অথচ চেতনায় স্পন্দিত। গভীর বলিয়াই নিখিল সৃষ্টিকে সে গর্ভে ধারণ করিতে পারিয়াছে ;

চেতনায় স্পন্দিত বলিয়াই সমস্ত প্রাণীকে সে বুকে করিয়া আছে। বিশালতায় সে ধরিত্রীর মতন; উচ্চতায় সে আকাশের মতন; সে অনাদি, অনন্ত, অসীম,—নিত্যতার মূর্ত্তি। সে নিজেকেই প্রকাশ করে, অথচ প্রমাণের অতীত থাকিয়া যায়।

বিবিধ উক্তি

মানবজাতির উন্নতির জন্য আড়ম্বরের সঙ্গে যে-সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার মূল্য যৎসামান্য।

যে নির্ব্বোধ অথচ অন্যের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, দরিদ্র অথচ প্রভুত্ব ফলাইতে চায়, বর্ত্তমানের রাজ্যে বাস করে অথচ অতীত যুগের পৌরাণিক আচারের অনুষ্ঠান করিতে যায়, তাহার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

চিত্তচেষ্টাশূন্য শাস্ত্রাধ্যয়ন বিড়ম্বনা শাস্ত্রচর্চ্চাহীন চিত্তচেষ্টা ভয়ঙ্কর।

ধনোপার্জ্জনই যদি মানুষের শ্লাঘার সামগ্রী হইত, তবে আমি গাড়ীর গাড়োয়ান হইয়াও টাকা রোজগার করিতাম; যখন দেখিলাম তাহা নয়, তখন, যাহা ভালো বুঝিয়াছি, তাহাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছি।

একাগ্রতা ও ধ্যানের জন্য সমস্ত দিন অনাহারে এবং সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় আমি কাটাইয়াছি; কিন্তু ফল পাই নাই; তাহার চেয়ে, গ্রন্থাধ্যয়ন ভালো।

ধর্ম্ম বনবাসী হইতে পারে না; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নূতন নূতন পল্লীর সৃষ্টি হইবেই।

সংযমের মাত্রাধিক্য অল্প লোকেই দেখা যায়।

প্রত্যেক লোকের দোষের সমষ্টি তাহার চরিত্রগত গুণসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করে; প্রত্যেকের দোষের ভিতরেই তাহার গুণেরও পরিচয় আছে।

প্রাচীনেরা যাহা মনে আসে তাহাই উচ্চারণ করিতে ইতস্তত করিতেন; পাছে কথা ও কাজের সামঞ্জস্য না থাকে ইহাই তাঁহাদের ভয়ের একমাত্র কারণ ছিল।

অমিতব্যয় অবিনয়ের জন্মদাতা; ব্যয়কুণ্ঠা কার্পণ্যের জনক।

সেনাব্যূহের মধ্য হইতে সেনাপতিকে হরণ করাও বরং সম্ভব কিন্তু নিঃস্বজনেরও সঙ্কল্প হরণ করা একেবারেই অসম্ভব।

অসদ্ব্যবহারের প্রতিদান যদি সদ্ব্যবহার হয়, তবে সদ্ব্যহারের প্রতিদান কিরূপ হইবে? যে হিতকারী তাহারই হিতসাধন কর্ত্তব্য অন্যায়কারীর প্রতি কেবল ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট।

যে স্বভাবত অনুদার তাহার আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠাতেই বা ফল কি? নামসংকীর্ত্তনেই বা ফল কি?

যে প্রকৃত ভদ্রলোক সে কথনো কলহ-

প্রিয় বা উদ্ধত হয় না; প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বল-পরীক্ষার সময়ে যে রূপ উত্তেজিত হয়, অন্য সময়ে কখনো সেরূপ হইতে দেখা যায় না; অথচ, মল্লযুদ্ধের আরম্ভ অভিবাদনে, সমাপ্তি করচুম্বনে। যে ভদ্র সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ভদ্র।

যদি ভুল করিয়াই থাক, তবে, তাহার সংশোধন করিতে লজ্জা বোধ করিয়ো না।

দুষ্টলোকে যাহার অখ্যাতি রটায় এবং সজ্জনে যাহার যশোকীর্ত্তন করে সেই ভাগ্যবান; ভালোমন্দ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকেরই প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা চরিত্রের পক্ষে হানিকর।

জ্ঞানার্থী সমুদ্রে আনন্দলাভ করে, ধর্ম্মার্থী পর্ব্বতপ্রবাসে সুখী হয়; কারণ, জ্ঞানার্থী চঞ্চল, ধর্ম্মার্থী প্রশান্ত।

সারবত্তা যদি সৌন্দর্য্যকে ছাড়াইয়া উঠে তবে সেই সারবত্তা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যতার নামান্তর

বাহিরের অলঙ্কার যদি সারবত্তাকে ছাপাইয়া যায় তবে তাহা চাকচিক্যময় বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। উভয়ের পরিমাণ-সাম্যই বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম্মনীতিজ্ঞ ব্যক্তি নিজে খাঁটি হইতে গিয়া আরো অনেককে খাঁটি করিয়া তোলেন; নিজের চেষ্টায় আলো জ্বালিয়া আরো পাঁচজনের অন্ধকার নাশ করেন; 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু'—ইহাই ধর্ম্মনীতির প্রথম সূত্র।

আমি দেবতার মতন মানুষ কখনো দেখি নাই, একজন মানুষের মতন মানুষ দেখিলেই খুসী হইয়া যাই; আমি নিষ্কলঙ্ক ধার্ম্মিক লোক দেখি নাই, একজন অকপট সহৃদয় লোক পাইলে বাঁচিয়া যাই।

শূন্য যেখানে পূর্ণতার ভাণ করে, নিঃস্ব যেখানে ঐশ্বর্য্যের ভাণ করে, অক্ষম যেখানে ক্ষমতার অহঙ্কার করে, সেখানে আমার এ অভিলাষ আংশিক ভাবে পূর্ণ হওয়াও কঠিন।

যে উত্তম সে গম্ভীর, অথচ গর্ব্বিত নয়; যে অধম সে গর্ব্বিত, অথচ গম্ভীর নয়।

আত্মমর্য্যাদা হারাইয়ো না, লোকে তোমায় শ্রদ্ধা করিবে; উদার হও, হৃদয় জয়ের যোগ্যতা লাভ করিবে; সত্যনিষ্ঠ হও, লোকে তোমায় বিশ্বাস করিবে; প্রযত্নবান্ হও, মহৎ সিদ্ধি তুমিই লাভ করিবে; পরের উপকার কর, তোমার কথা লোকে ঋষিবাক্যের মতন আনন্দের সহিত পালন করিবে।

কোন্ গাছটি যে চিরহরিৎ তাহার পরিচয় কেবল শীতকালেই পাওয়া যায়।

কাঁটা বনের প্রজাপতি

[লৌৎস্থ ঋষির প্রায় দুই শত বৎসর পরে চুয়াংস্থ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁকে লৌৎস্থর মানস-পুত্র বলা যাইতে পারে। ইনি প্রতিভা--বান অথচ আলাপ-বিমুখ, উৎসাহী অথচ উদাসীন, কূটতার্কিক অথচ কল্পনাকুশল, সংশয়াত্মা অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ। ইনি কংফুশিয়োর আচার-সর্ব্বস্ব ধর্ম্মনীতিসূত্রের "ভব্যতার গণ্ডী মাঝে শান্তি" না মানিয়া লৌৎস্থ-প্রবর্ত্তিত 'তও'-বাদ বা ব্রহ্মবাদে দীক্ষিত হন। চুয়াংস্থর রচনাবলী সৌন্দর্য্য ও সরসতায় প্রাচীন চীন-সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

লৌৎস্থ যে সমস্ত ভাব অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছিলেন, চুয়াংস্থ উহাদিগকে ফলপুষ্পিত করেন। তাঁহার নিজের "নব নব উন্মেশালিনী বুদ্ধির" গভীরতাও নিতান্ত অল্প ছিল না।

চীনেব শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরা বলেন, "চুয়াংস্থর রচনা সমুদ্রেব মত ; হাজার ডুব দাও, সকল রত্ন নিঃশেষে আহরণ করিতে পারিবে না। অনেক বহস্য অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইবেই। উহার গভীরতাব কেহ পরিমাণ করিতে পারে না। ব্যঞ্জনায় ও অব্যক্ত ভাবের স্বচনায় চুয়াংস্থ অদ্বিতীয় ; এবং এই দুইটি গুণই মনস্বীদিগেব অননুকরণীয় রচনাব প্রধান লক্ষণ।"

খ্রীষ্টের যেমন সেণ্ট্ পল, বুদ্ধের যেমন বোধিধর্ম্ম, সক্রেটিসের যেমন প্লেটো, ডারুইনের যেমন হাক্সলি, লৌৎস্থর তেমনি চুয়াংস্থ। গুরুর ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও শিষ্যের প্রতিভা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে নাই।

চুয়াংস্থর দর্শন কাব্যেব মত মনোজ্ঞ ; তাঁহার গদ্য পদ্যের মত শ্রুতিমধুর। তিনি তর্কসঙ্কুল দার্শনিক জটিলতার মধ্যে লঘুগতিতে অবলীলাক্রমে বিহার করিতেন বলিয়া

কাঁটা বনের প্রজাপতি

চীনদেশীয় রসজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'কাঁটা বনের চিত্রপতঙ্গ' বলিয়া থাকেন; তাঁহার গ্রন্থকে বলেন "প্রজাপতির মৌন গুঞ্জন"।]

খেয়ালীর খেয়াল

একবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আমি যেন একটি প্রজাপতি। খেয়ালের ঝোঁকে ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইতেছি; ষোল আনাই প্রজাপতি! আমি যে মানুষ সে কথাটা আমার মনেই ছিল না। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিলাম, আমি আমিই; যেখানকার মানুষ সেইখানেই পড়িয়া আছি।

আমি মানুষ স্বপ্নে পতঙ্গ হইয়াছিলাম, না, আমি পতঙ্গ, স্বপ্নে মানুষ হইয়াছি? কে জানে! পতঙ্গ ও মানুষের মধ্যে অবশ্য তফাৎ আছে, সেই সীমাটুকু পার হাওয়ার নামই জন্মান্তর।

কূপমণ্ডুকের কাছে সাগরের কথা তুলিয়ো না; সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাহার দিন কাটিয়াছে

সে সাগরের মর্ম্ম কি বুঝিবে? স্বল্পায়ু পতঙ্গের কাছে সনাতন সত্যের উল্লেখ করিয়ো না; সে ক্ষুদ্র প্রাণী, মহৎভাবের ধার ধারে না। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'তও'য়ের তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়ো না; কাক ক্রান্তির ক্ষুদ্রতা যাহার হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে স্বর্গ ও মর্ত্তের আদিম সত্ত্বা, বিশ্বজগতের বিধানদাতা সনাতন 'তও'য়ের তত্ত্ব—ধারণায় আনিতে পারিবে না।

শরতের একটি তৃণমঞ্জরী পৃথিবীর মধ্যে বড় জিনিস; প্রকাণ্ড পর্ব্বত তাহার তুলনায় তুচ্ছ। যে শিশু শৈশবে মরিয়াছে তাহার মত বুড়া জগতে নাই। বিশ্বজগতের যেদিন জন্ম হইয়াছে আমার জন্মও সেই দিন; বিশ্বজগৎ আমার যমজ ভাই।

চতুঃসাগর—বিশ্বসংসারের তুলনায় সে কি গোষ্পদের মত নহে? সাগরবেষ্টিত চীনসাম্রাজ্য —সে কি শস্যভাণ্ডারের মধ্যস্থিত একটা

তণ্ডুলকণার মত নহে? অসংখ্য সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ অশ্বগাত্রের একটি কেশাগ্রের মতই নগণ্য।

আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান হইতেই বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানের উৎপত্তি; আত্মা হইতেই অনাত্ম বস্তুর অনুভূতি; অথচ, সবই আত্মনিষ্ঠ, আবার, সবই বিষয়নিষ্ঠ। ইহাকেই বলে বিকল্পের উপপত্তি।

আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান ও বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞান একত্র অবস্থান করিয়াও যদি পরস্পর নিরপেক্ষ থাকে, তবে সেই জ্ঞানকে 'তও'য়ের মেরুদণ্ড বলা যায়; তাহা যখন সমস্ত সনাতন সত্তার কেন্দ্রস্থলের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হয়, তখন অস্তি ও নাস্তি সংমিলিত হইয়া অদ্বিতীয় একে পরিণত হয়।

'তও'য়ের হিসাবে তৃণে ও স্ফটিকস্তম্ভে প্রভেদ নাই; সুন্দরে কুৎসিতে, ক্ষুদ্রে মহতে, উত্তমে অধমে, বিকৃতে অদ্ভুতে, কোথাও

অসামঞ্জস্য নাই। সৃষ্টিই ধ্বংস, ধ্বংসই সৃষ্টি ; ভাঙাও নাই, গড়াও নাই ; সমস্তই একের মধ্যে সমাহিত।

বাঁচিবার স্পৃহা যে আমাদের মনের ভুল নয়, তাহা কেমন করিয়া জানিব ? দরিদ্রের মেয়ে রাজা স্বামীর ঘরে যাইতেও কাঁদে ; পরে যখন রাজভোগের আস্বাদ বুঝিতে পারে, তখন কান্নার কথা মনে পড়িলে, নিজেই মনে মনে লজ্জিত হয়। মৃতেরাও হয় তো জীবনের প্রতি মমতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হয় ; কে জানে !

মানুষের জ্ঞান সীমাবিশিষ্ট; মানুষ না-জানার উপর নির্ভর করিয়াই সকল জ্ঞানের আধার 'তও'কে জানিতে পারে।

মহৎ সত্বা, মহাশূন্য, মহা নাম, মহান্ ঐক্য, মহৎ সত্য, মহৎ বিধান, ইহাদের জ্ঞানই জ্ঞানের চরম।

মনে কর খেয়ার নৌকার সঙ্গে একখানা

খালি নৌকার ধাক্কা লাগিবার উপক্রম হইয়াছে ; মাঝি, স্বভাবত বদমেজাজী হইলেও, এ ক্ষেত্রে চটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু খালি নৌকাখানা যদি খালি না হইয়া উহাতে এক-জনও মানুষ থাকিত, তবে, খেয়ার মাঝি ঐ লোকটিকে সাবধান হইতে বলিত ; লোকটা শুনিতে পায় নাই এরূপ মনে হইলে আরো দুই তিনবার হুঁসিয়ার হইতে বলিত ; তাহার পরেই গালিবর্ষণ আরম্ভ হইত। প্রথম ক্ষেত্রে মাঝি চটে নাই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চটিয়াছে। মানুষের পক্ষেও ঠিক ঐরূপ ; যে মানুষ শূন্য নৌকার মত সারাজীবন ভাসিয়া চলিতে পারে, ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহার কোনো অনিষ্ট হয়না, লোকে তাহাকে বাঁচাইয়া চলে।

জলে নৌকা ভালো, ডাঙায় গাড়ীই ভালো। বর্ত্তমান ও অতীত,—ডাঙা ও জল ; সত্যযুগের নিয়ম কলিযুগে খাটাইতে যাওয়া

ডাঙায় নৌকা চালানোর মতন ; শ্রম যথেষ্ট, ফল শূন্য ; লাভের মধ্যে টিট্‌কারী।

মানুষ যখন মরে তখন বুঝিতে হইবে তাহার সময় পূর্ণ হইয়াছে ; একথা যিনি বুঝিয়াছেন তাঁহার অন্তরে শোকেব স্থান নাই। ইন্ধন ফুবায় কিন্তু আগুন অন্যত্র নীত হইতে পারে ; আগুনের পরমায়ু যে ইন্ধনেব সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া যায় এমন কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পাবি না।

মানবজীবন লাভ কবা,—সেই তো এক আনন্দের বিষয় ; তাহার উপর, একমাত্র অনন্তের অভিমুখে দৃষ্টি রাখিয়া, রূপ হইতে রূপান্তবে, ক্রমাগত নানা পবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যাওয়া,—সে সুখের তুলনা নাই।

'তও' জন্মের সময়ে আমাকে এই শরীর দিয়াছেন, যৌবনে কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিয়াছেন, বার্দ্ধক্যে নিবৃত্তি দিয়াছেন এবং মৃত্যুতে

বিশ্রামের অধিকারী করিয়াছেন। জীবনে যাঁহার দয়ার বিধান প্রত্যক্ষ করিয়াছি জীবনান্তেও তিনিই আমার নির্ভর।

তপ্ত লৌহের একটা বুদ্বুদ যদি হঠাৎ উদ্ভূত হইয়া লৌহকারকে বলে "ওগো আমাকে শাণিত তরবারিতে পরিণত কর" তবে আমার মনে হয় ঐ প্রগল্‌ভ বুদ্বুদটাকে লৌহমল বিবেচনা করিয়া, লৌহকার কটাহ হইতে তুলিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিবে। আমার মত অধম যদি ক্রমাগত ভগবানকে বলে "ওগো আমাকে মানুষ কর", আমার মনে হয়, তিনিও আমাকে বাচাল বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। এই সংসার তপ্ত কটাহ; ভগবান লৌহশিল্পী; তিনি আমাকে যেমন করিয়া গড়িবেন তাহাতেই আমি খুসী হইব; তিনি আমাকে যেখানে রাখিবেন আমি সেইখানেই থাকিব এবং অতীতের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া,

জন্মে জন্মে, স্বপ্ন-বিবর্জ্জিত নিদ্রার অবসানে নব আনন্দে জাগিয়া উঠিব।

জ্ঞানীর নিবৃত্তি বিষয়ীর কর্ম্ম বিরতি নহে। ইহা জড়তা নহে; ইহা তাঁহার মানসিক ভাবেরই অভিব্যক্তি। বিশ্বকোলাহল তাঁহার অন্তঃসামঞ্জস্যকে টলাইতে পারে না, এইজন্যই তিনি প্রশান্ত, আত্মস্থ। জল যখন স্থির থাকে, তখন সে ঠিক দর্পণের মত, ভ্রূর লোমগুলি পর্য্যন্ত গণিতে পারা যায়; সেই জন্য, এইরূপ নিস্তরঙ্গ জলাশয় সমতলের আদর্শ, তলসাম্যের নিরিখ্। চাঞ্চল্য-বর্জ্জিত মন স্থির সরোবরের মত স্বচ্ছ; তীরস্থ ক্ষুদ্র তৃণটি হইতে নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বের প্রতিবিম্ব ইহারই মধ্যে ধরা পড়িয়া থাকে। ইহা জ্ঞানিজনের আদর্শ।

স্রোতের জলে কেহ চেহারা দেখিতে যায় না, যাহা নিজে চঞ্চল তাহা অন্যকে ধারণ করিবে কেমন করিয়া?

কংফুশিয়ো কি যথার্থ জ্ঞানী? তাঁহার এত শিষ্য হইল কিরূপে? তর্কনিপুণতা ও বাক্‌পটুতাই তো তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। প্রকৃত জ্ঞানীরা তর্কবিদ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করাকে চোরের বেড়ীর মতন মনে করিয়া থাকেন।

দেবকোটি মানুষ মানুষের কাছে দেবতার মত, কিন্তু, ভগবানের কাছে নিতান্ত সাধারণ; এই জন্যই বলে, 'স্বর্গে যে অধম পৃথিবীতে সেই উত্তম, পৃথিবীতে যে উচ্চ স্বর্গে সে তুচ্ছ।'

মানুষের হৃদয় স্বভাবত ভালো; কিন্তু, তাই বলিয়া, ঘাঁটাইয়ো না। তাহাকে খোঁচাইয়া তোলাও খারাপ; দাবাইয়া রাখাও খারাপ; দুইয়েরই পরিণাম ভয়ঙ্কর।

যে নিজেকে মূর্খ বলিয়া জানে সে কথনো মূর্খের সর্দ্দার হইতে পারে না।

যুদ্ধ নিম্ন শ্রেণীর বিচারক; দণ্ড পুরস্কার নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক; আইন কানুন নিম্ন

শ্রেণীর শাসনকর্ত্তা ; রেশমী পোষাকে নিম্ন-শ্রেণীর আনন্দ ; রোদন ও হাহাকার নিম্ন শ্রেণীর শোক।

প্রাচীনেরা দুইটি ধর্ম্মশালা স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন ;—একটির নাম 'দানপুণ্য,' আর একটির নাম 'কর্ত্তব্যনিষ্ঠা' ; ও সব আশ্রয়ে একরাত্রি আনন্দে কাটাইতে পার ; কিন্তু, তাহার বেশী থাকিতে গেলেই মুস্কিল।

মানুষের জীবন রন্ধ্রপথে সূর্য্যরশ্মির মতন ; এই আছে, পরমুহূর্ত্তেই অন্তর্ধান।

জন্মই আরম্ভ নয়, মৃত্যুই অবসান নয়।

জ্ঞান অজ্ঞেয়ের সীমায় পৌছিয়া স্তব্ধ হইয়া যাক্ ; ইহাই জ্ঞানের পূর্ণতা ; ইহাই যথার্থ পরিণতি।

খণ্ড জ্ঞানের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ কর, মহাজ্ঞান তোমার চিত্তকে উদ্ভাসিত করিবে। সৎ হইবার জন্য আড়ম্বর করিয়ো না, আপনা আপনি ভাল হইবে। শিশুরা বেশ কথা

কহিতে শেখে, সে জন্য তাহাদিগকে ভাষাতত্ত্ববিদের দ্বারস্থ হইতে হয় না।

অনুদ্যোতক

চুয়াংসু মাছ ধরিতেছিলেন; এমন সময়ে, রাজার তরফের দুই জন কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, যে, স্বয়ং রাজা তাঁহাকে রাজ্যের ব্যবস্থাপক হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

চুয়াংসু ছিপের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, "শুনেছি এ রাজ্যে তিন হাজার বছরের মরা একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপের খোলা আছে, আর সেই খোলাটাকে দেব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাজা স্বয়ং তার পূজা ক'রে থাকেন। আচ্ছা, জীয়ন্ত থেকে কাদায় ল্যাজ নেড়ে বেড়ানো, আর, মরে গিয়ে মন্দিরে পূজা পাওয়া,—এই দু'টো অবস্থার মধ্যে যদি কচ্ছপটাকে একটা অবস্থা বেছে পছন্দ ক'রে

নিতে বলা হ'ত, তবে, সে নিজে কোন্ অবস্থাটা পছন্দ কর্‌ত ?"

রাজকর্ম্মচারীরা দুই জনেই বলিয়া উঠিল "বেঁচে থেকে কাদায় ল্যাজ নাড়াই পছন্দ কর্‌ত।"

চুয়াংসু বলিলেন "তবে পালাও, আমিও এই কাদায় পড়েই ল্যাজ নাড়্‌ব।"

একবার গুজব উঠিল, চুয়াংসু রাজমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। লোকে মন্ত্রীকে বলিল "চুয়াংসু তোমার বদলে মন্ত্রী হ'তে আস্‌ছেন।" মন্ত্রী ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তিন দিন তিন রাত্রি ধরিয়া চুয়াংসুকে দেশময় খুঁজিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে, চুয়াংসু নিজেই আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দক্ষিণে একটা পাখী আছে, সে গরুড় জাতীয়; সে দক্ষিণ সাগর থেকে যাত্রা ক'রেছে, যাবে উত্তর সাগরে,—ক্রমাগতই

উড়্ছে; অক্ষয় বট ভিন্ন অন্য কোনো গাছের শাখায় সে বিশ্রাম করে না; বাঁশের তণ্ডুল ভিন্ন আর কিছুই খায় না। একটা পেঁচা একটা মরা ইঁদুর আগ্‌লে বসেছিল, সে গরুড়কে উড়ে আস্‌তে দেখে 'খিচ্' 'খিচ্' ক'রে উঠ্‌ল। তুমি এ গল্প শোনো নি? আশ্চর্য্য! কিন্তু সে কথা থাক্। তুমি তোমার মন্ত্রীত্ব নিয়ে সুখে থাক, তোমার পদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও লোভ নেই।"

আদর্শের দ্রষ্টা

[কংফুশিয়ো অর্থাৎ আচার্য্য কংয়ের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে, চীনসাম্রাজ্য ভয়ানক বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ক্ষমতাপন্ন রাজন্যেরা তখন স্ব স্ব প্রাধান। চারিদিকে যুদ্ধ, চারিদিকে বিপ্লব; দস্যুর উৎপাত, ফৌজের উপদ্রব। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ। জনসাধারণ সন্ত্রস্ত, 'চাচা আপন বাঁচা' নীতির অনুসরণ করিতেছে। ঠিক এই সময়ে মহাত্মা মাংসুর জন্ম। ইহাঁর যখন বয়স তিন বৎসর সেই সময়ে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মাংসুর জননী বিদুষী ছিলেন, এই অসহায়া বিধবার অক্লান্ত চেষ্টায় মাংসু ক্রমশঃ নানা শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হইয়া ওঠেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া মাংসু একটি

টোল স্থাপন করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার টোল বিভিন্ন দেশীয় প্রতিভাবান শিষ্যের সমাগমে ক্রমশঃ সাম্রাজ্যব্যাপী খ্যাতি লাভ করে। মাংস্থ নিজে কংফুশিয়োর মানস পুত্র ; কংফুশিয়োর রচনা পড়িয়া ইনি উহাঁকে গুরু বলিয়া বরণ করেন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে মাংস্থ শিষ্য-সেবক সঙ্গে করিয়া দেশ পর্য্যটনে বাহির হন। দেশের দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ এবং দুর্দ্দশার প্রতীকারই তাঁহার চীন-পরিক্রমার উদ্দেশ্য। তিনি বহুতর সামন্ত রাজার দরবারে উপস্থিত হইয়া অকুতোভয়ে নিজের মত প্রচার করিয়াছিলেন। অনেক স্বার্থান্বেষী রাজমন্ত্রী এবং ক্ষুদ্রচেতা পণ্ডিতম্মন্য রাজপুরুষকে তর্কে পরাজিত করিয়া মাংস্থ চীনজাতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। শেষে নিজের জীবদ্দশায় স্বজাতির নৈতিক উন্নতি সম্পূর্ণভাবে সংসাধিত হওয়া অসম্ভব দেখিয়া আপনার সমস্ত মতামত

লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৮৯ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কংফুশিয়ো-প্রবর্ত্তিত পিতৃপূজার প্রাচীন মার্গ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মর্য্যাদার ক্রম রক্ষা করিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে পারিবারিক আদর্শ পুনঃ সংস্থাপন করাই মহাত্মা মাংস্যুর জীবনের এবং গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি একদিকে সাম্যবাদের সকল সূত্র নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবার বিরোধী ছিলেন অন্যদিকে রাজবংশের দেবত্বে ইহাঁর আস্থা ছিল না।

মহামানবের অন্তর্নিহিত যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে এবং দেশে দেশে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, মহাত্মা মাংস্যুও সেই মহাশক্তির প্রেরণায় কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন; সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মাংস্যু আদর্শের দ্রষ্টা—মহাপুরুষ।

মাংস্থর উক্তি

পৃথিবীরূপ বিপুলায়তন বাস্তুভিটায়, সমগ্র মানবজাতি রূপ প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে, নির্ব্বিবাদে যে ঠিক নিজের উপযুক্ত আসন বাছিয়া লইতে পারে সেই মহাপুরুষ।

ন্যায়ানুমোদিত পন্থাই যথার্থ মহাযান, এই পথ মহাজনদিগের।

যিনি প্রকৃত মহাত্মা তিনি দেশের মধ্যে উচ্চ পদ লাভ করিলে নিজের হৃদ্গত নৈতিক ও সামাজিক আদর্শকে বাস্তবের জগতে আকার দিতে চেষ্টা করেন; অকৃতকার্য্য হইলে অন্ততঃ নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই উহাকে কথঞ্চিৎ সার্থকতা দিয়া থাকেন; আদর্শকে কখনো ত্যাগ করেন না।

যিনি পদস্থ হইয়াও আপনার প্রভাব, পদমর্য্যাদা ও ধন-সমৃদ্ধির অপব্যবহার না করেন তিনিই মানুষ। যিনি দরিদ্র হইয়াও

ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত না হন এবং প্রবলের পীড়নেও নিজের নিজত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তিনিই যথার্থ মানুষ নামের যোগ্য।

দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং প্রধান শক্তি—সাধারণ প্রজা; মঠ মন্দির তাহার নীচে; মঠ মন্দিরের নীচে রাজা। গুরুত্বে জনসাধারণ জ্যেষ্ঠ; রাজা সর্ব্ব কনিষ্ঠ।

জলের ধারা পূর্ব্বদিকেও বহিতে পারে, পশ্চিম দিকেও বহিতে পারে; তাই বলিয়া, নির্ব্বিচারে নীচের দিকে গড়ায় বলিয়া, ঊর্দ্ধ-দিকে কখনো গড়াইয়া যাইতে পারে না। জলের যেমন স্বাভাবিক গতি নিম্নাভিমুখী মানুষের তেমনি স্বাভাবিক গতি সত্তার অভিমুখে। জলে ঢিল মারিলে উহা উদ্ধত হইয়া উষ্ণীষে আসিয়াও লাগিতে পারে, বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে জল পাহাড়েও চড়ে। কিন্তু এই সব উন্মার্গগামিতা উহার

পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ইহা বলপ্রয়োগের ফল, কৌশলের কর্ম্ম। মানুষও যখন সততার বিরোধী কোনো আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে সে প্রকৃতিস্থ নয়; বুঝিতে হইবে যে বাহ্যিক বলপ্রয়োগের ফলেই এই বিকৃতি। বাহিরের কৌশলে মোচড় খাইয়া সে নিজের স্বাভাবিক পথটি পরিত্যাগ করিয়াছে।

বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তি, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা, এবং হিতৈষণা এ সমস্তই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি; ইহা বাহির হইতে পাইবার নয়। ইহা চিত্ত-পুরুষের শীর্ষ, হৃদয়, বাহু এবং জঙ্ঘা।

জিহ্বা স্বাদু অন্নের অন্বেষণ করে, চক্ষু সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী, কর্ণ সুস্বরের প্রয়াসী, হস্ত পদ মাঝে মাঝে আরাম চায়; কিন্তু, সকল অবস্থায় সকল মানুষের পক্ষে এ সমস্ত সুখ-সম্ভোগ সহজ হইতে পারে না। সুতরাং 'অমুক অমুক জিনিষ না হইলে আমার চলিবেই

না’ এমন কথা বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের কথা হওয়া উচিত নয়।

মানুষ যতই মন্দ হউক, সে যদি চিত্ত সংযম অভ্যাস করিতে পারে, তবে ভগবৎ-পূজার অধিকারী হয়।

হৃদয়টি যাহার শিশুর মতন সেই মহাত্মা।

নিজের নির্লজ্জতায় যে লজ্জিত হয় ভবিষ্যতে সে আর লজ্জা পায় না।

তরবারির সাহায্যে যে জয় করে, সে হৃদয় জয় করিতে পারে না; যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া বশীভূত করিতে পারে সেই জগতের মন পায়।

সম্রাট যদি ন্যায় অন্যায় ভুলিয়া, কেবল, নিজ সাম্রাজ্যের লাভের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি রাখেন, তবে রাজপুরুষেরা নিজ নিজ পরিবারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিকেই নজর রাখিবে; জনসাধারণ ব্যক্তিগত স্বার্থকেই পরমার্থ করিয়া তুলিবে। ছোট বড় সকলের মধ্যেই কাড়া-

কাড়ির একটা কোলাহল পড়িয়া যাইবে, সাম্রাজ্যের পক্ষে ইহা অমঙ্গলের কথা।

রাজ্যের সমস্ত গৃহে ও সকল পাঠশালায়, দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা যদি যথার্থভাবে পিতৃভক্তি ও জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তিতার শিক্ষা প্রচলিত করা যায়, তবে পলিত কেশ জরা-জর্জ্জরিত বৃদ্ধ মুটিয়ার মোটবহনরূপ বিসদৃশ দৃশ্য জগৎ হইতে একেবারে লুপ্ত হওয়াও একদিন সম্ভব হইতে পারে।

হে সামন্তরাজ! তোমার কুকুরে ও শূকরে তোমার প্রজার অন্ন ধ্বংস করিতেছে; তুমি সঞ্চয়ের মাহাত্ম্য জান না। দুর্ভিক্ষে মানুষ পথে পড়িয়া মারা যাইতেছে অথচ শস্য-ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিতে তুমি কুণ্ঠিত! অনশনে মানুষ মরিতেছে, আর তুমি বলিতেছ "দুর্ব্বৎসর—আমি কি করিব?" যে লাঠি মারিয়া মানুষ খুন করে, সেও তো বলিতে পারে "লাঠিটাই দুষ্ট, আমি কি

করিতে পারি ? আমি নির্দ্দোষ।” দুর্ব্বৎসরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়ো না ;—অবিলম্বে রাজ্যের লোক তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।

আস্তাবলে তোমার ঘোড়াগুলির চেহারা বেশ পুষ্ট। গোহালে তোমার গরুগুলিও নধর ; কিন্তু তোমার প্রজাদের মূর্ত্তি দেখিলে উহাদিগকে সকল কালেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বলিয়া মনে হয় ; শস্যক্ষেত্রে নরকঙ্কাল যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাকেই বলে বনের পশু দিয়া মানুষ খাওয়ানো।

পশুরা পরস্পরের হিংসা করে, স্বজাতির মাংস খায় ; মানুষ সেইজন্য পশুকে ঘৃণা করে। আর মানব সমাজের তুমি রাজা, প্রজার তুমি পিতৃস্থানীয় ; পশুর পুষ্টির জন্য সন্তানের প্রাণনাশ করা কি পিতার কাজ ?

যে রাজা যথার্থ প্রজাদিগকে ভালবাসেন এবং দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে রক্ষা করেন

রাজচক্রবর্ত্তিত্ব তাঁহার অবশ্যম্ভাবী, কেহ উহা রদ করিতে পারে না।

মাছ খুঁজিত যে গাছে ওঠে, সে যে ব্যর্থকাম হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

প্রতিকূল অবস্থাতেও যে মহত্ত্বের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয় তাহাকেই যথার্থ শিক্ষিত বলা যায়।

উদরান্নের অসংস্থান ঘটিলেও যে নীতি-ধর্ম্মের কঠিন শাসন মানিয়া চলে সেই শিক্ষিত।

বাঁধা আর না থাকিলেও যে বুক বাঁধিতে পারে সেই মানুষ। অবস্থার বিপর্য্যয়ে অধিকাংশ লোক নিজের নিজত্ব হারায়, এমন অবস্থায় নীতিধর্ম্মের মুখ্য সূত্রগুলি জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখা সুকঠিন; কিন্তু যে রাখে সেই মানুষ; সেই প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছে।

রাজার বিধিব্যবস্থা ভাল হইলে প্রজা কখনো কুপথে যাইতে পারে না। ভক্তিভাজন

পিতা মাতা এবং স্নেহ-ভাজন পুত্রকন্যার ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ যাহাতে প্রত্যে-কের পক্ষেই সহজসাধ্য হইয়া ওঠে, রাজ্যে এম্‌নি সকল বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হয়।

সুবৎসরে যাহাতে প্রত্যেক প্রজা উদ্বৃত্ত শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে রাজার সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহা হইলে দুর্ব্বৎসরে আর অনশনে লোকক্ষয়ের ভয় থাকে না।

সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এবং আইনের দ্বারা ও শিক্ষার প্রভাবে অপচয় এবং অপব্যয় নিবারিত হইলে প্রজামাত্রেই খুসী থাকে; সে অবস্থায় তাহারা রাজার প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে সহায় হইতে পারে। রাজার সঙ্গত আজ্ঞা তখন তাহারা স্বেচ্ছায় এবং সানন্দেই পালন করে।

শৈশবে, মানুষ বাপ মাকে ভালবাসে, যৌবনে

স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে। রাজার চাকরী পাইলে রাজাকে ভালবাসে; আবার কর্ত্তব্য করিয়াও রাজার মন না পাইলে ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে।

প্রজার চক্ষু দেবতার চক্ষু, প্রজার কাণ দেবতার কাণ। প্রজা দেখিলে দেবতা দেখিতে পান, প্রজা শুনিলে দেবতা শোনেন।

যে ঘটনা বিশেষ কেহ ঘটাইল বলিয়া বোধ হইল না অথচ ঘটিয়া গেল, তাহা দৈব ঘটনা; যে কাজ বিশেষ কোনো ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল বলিয়া মনে লয় না, অথচ সম্ভব হইল, তাহা দেবতার কর্ম্ম।

বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে শৃঙ্খলার সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি জনকে সেই নূতন তত্ত্বটি শিখাইয়া দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য। দেবতারা যাহাকে আগে খবর দেন সে যে তাহা নিজের মনের মধ্যে চাবী দিয়া রাখিবে দেবতাদের ইহা কখনই অভিপ্রেত নয়।

আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা সকলকে বুঝাইব, যাহা জানিয়াছি তাহা ঘোষণা করিব, যাহা পাইয়াছি তাহা বিলাইব।

নিজে কুঁজা হইয়া কে কবে অন্যকে সোজা করিয়াছে? নিজেকে কলঙ্কিত করিয়া দেশকে গৌরবান্বিত করিবে কোন্ কৌটিল্য?

কোনো মহাপুরুষ সাম্রাজ্যের ভার নিজের স্কন্ধে লইয়া দেশ ও জাতিকে উন্নত করিয়াছেন; কেহ বা সাম্রাজ্যের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া দিন কাটাইয়াছেন; উভয়েরি কিন্তু এক আদর্শ—জীবনের পবিত্রতা; এক উদ্দেশ্য—ঐ পবিত্রতার সম্যক্ সংরক্ষণ।